একক ৫১ ❐ জীবনানন্দ দাশ ঃ তিনটি কবিতা

গঠন

৫১.১ উদ্দেশ্য

৫১.২ প্রস্তাবনা

৫১.৩ জীবনানন্দ দাশ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

৫১.৪ মূলপাঠ—১ ঃ বনলতা সেন

৫১.৫ সারাংশ—১

৫১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

৫১.৭ মূলপাঠ—২ ঃ বিড়াল

৫১.৮ সারাংশ—২

৫১.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৫১.১০ মূলপাঠ—৩ ঃ ভিখিরি

৫১.১১ সারাংশ—৩

৫১.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৫১.১৩ উত্তরমালা

৫১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৫১.১ উদ্দেশ্য

প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষত বিশ ও তিরিশের দশকে এক তরুণ কবি-গোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্যের বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে এসে স্বতন্ত্র ধরনের নতুনতর কাব্যসৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বব্যাপ্ত প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে, শুধু তাঁর প্রতিধ্বনি হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়। কল্লোল-কালিকলমের যে কবিকুল সমকালের প্রেক্ষাপটে নতুন পথের সন্ধান করছিলেন জীবনানন্দ বোধ করি তাঁদের মধ্যে ভাব স্বাতন্ত্র্য ও কাব্যভঙ্গিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। এ হেন কবির কাব্য ও কৃতি সম্পর্কে আপনার বিশেষভাবে জানবার সুযোগ ঘটবে তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। আপনি কবির—

- কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যনির্মাণে অভিনবত্ব,
- প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ-এর পরিচয়
- কাব্যের উপমা ও চিত্রকল্পে অনন্যতা
- কালচেতনা ও ইতিহাসবোধ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা বক্তব্য প্রধান নয়
- ইতিহাস ও সমাজচেতনা এক তীক্ষ্ণ নতুন বেদনাবোধ সঞ্চার
- রচনায় বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণে শূন্যতা ও নির্জনতার একটি পরিমণ্ডল ফুটে উঠেছে

- রোমান্টিক মেজাজ ও মহৎ প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা অন্তরাশ্রয়ী হওয়ায় বিষণ্ণতা তাঁর কবিতার অন্তর্লগ্ন হয়েছে
- কাব্য প্রকরণে অচিন্তিত পূর্ব বৈচিত্র্য—প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। আর এই ধারণা থেকে জীবনানন্দ ও তাঁর সমকালের কবিদের রচনা বিশ্লেষণ করে তাঁদের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আপনি আলোচনা করতে পারবেন।

৫১.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় এককে আপনি আধুনিক বাংলাকাব্যে ১৯শ ও ২০ শতকে দেশকালগত পার্থক্য জনিত কারণে কবি ধর্ম ও কবিকৃতির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণ ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনেছেন। সেই পরিচয় সূত্রে তৃতীয় এককে ১৯শ শতকের কবি মধুসূদন ও তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য ষষ্ঠ সর্গ পাঠ ও চতুর্থ এককে ১৯শ-এর উত্তরার্ধ ও ২০শ শতকের প্রথমার্ধের কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম এককে একান্তভাবে প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কবি নজরুল ইসলামের কবিতার মধ্য দিয়ে যুগলক্ষণগুলি সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা জন্মেছে। বর্তমান এককের কবি প্রথম যুদ্ধোত্তরকালের দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু সমসাময়িক সকল কবির চেয়ে কল্পনা ও প্রকাশে বিশেষ স্বতন্ত্র।

জীবনানন্দের প্রথম কবিতা ('বর্ষ আবাহন'—ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩২৬) প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯১৯ সেই সময় থেকে আমৃত্যু (মৃত্যু ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪) তিনি কাব্যরচনা করে গেছেন। সুতরাং তাঁর কাব্যরচনার পরিসর প্রায় ৩৫ বছর। এ সময়টি থেকে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য রচনারও সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর সংখ্যাও অগনিত। সেই সঙ্গে অনুসারীও কম ছিল না। বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো হতে গিয়ে তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দ অনুসরণ করেও—যেহেতু দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ হওয়া অসম্ভব,—তাই লোকদৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছেন। প্রমথনাথ ও ভুজঙ্গাধর রায়চৌধুরী, রমনীমোহন ঘোষ ইত্যাদি তাই বিস্মৃত নাম। কিন্তু করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্র ভাবানুভূতির পরিচয় সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র কবি ব্যক্তিত্ব থাকায় এঁরা রবিরশ্মিকে শুধু প্রতিফলিত করেননি। স্বকীয় ধ্যানধারণা নিয়ে স্বতন্ত্র একটি কাব্যাদর্শক তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। এটিও ছিল অনেকাংশে রবীন্দ্র ছায়াছন্ন। এঁরা লোকায়ত সংস্কার ও রোমান্টিক ভাবনার সম্মিলনের অনেকটা চেষ্টা করেছিলেন, ফলে এঁরা বাংলাকাব্যে অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছর কয়েকজন কবিকে আমরা পেয়েছি যাঁদের কবিতা সে সময় পাঠক সমাজকে সচকিত করে তুলেছিল। নজরুলের বিদ্রোহ, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক আবহ নিয়ে আসে। রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত ও রবীন্দ্র ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় ছন্দের দোলা, বাঙালির সমাজ ও প্রতিবেশের নানা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন—রচিত হয়েছে 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা', ইলশে গুঁড়ি', এবং 'গান্ধিজী', 'নফর কুণ্ডু', 'জাতির পাঁতি', 'মেথরের' মতো কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ দেশি বিদেশি কাব্যের অনুবাদ করে বাংলা কাব্যে দেশ বিদেশের মনোভূমিকে কাছে নিয়ে এসেছেন। তিনিই প্রথম গাড়োয়াল ধর্মঘট এবং ১৩১৩ সালে কিংবা তারো আগে 'সাম্যসাম' রচনা করে অসামান্য ঘটনা ঘটিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

> "মানিনা গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর
> দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তার ঘর।"—

একথা তিনি প্রথম বলেছেন যেমন সত্য, তেমনি সত্য যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও শ্লেষমিশ্রিত উচ্চারণ ও নজরুলের বিদ্রোহদীপ্ত ঘোষণা। এঁদের কবিতায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আধিক্য অনিবার্যভাবেই বাংলা কবিতার সে সময়ের পাঠককুলকে আকৃষ্ট করেছিল। এসব থেকে এই ধারণা জন্মানো সম্ভব হল যে, রবীন্দ্র কাব্যধারার সর্বত্রসঞ্চারী প্রভাবের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রকাশ সম্ভব। এঁরা বাংলা কবিতায় আমদানি করলেন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার ও জীবনাদর্শের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন 'মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ নেই'। তিনি মেথরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। যতীন্দ্রনাথ চাষিকে ভাই বলে কাছে টেনে নিলেন, নজরুল আরও একধাপ এগিয়ে 'বারাঙ্গানাকে' মাতৃসম্বোধন করলেন। ওদিকে মোহিতলাল কাব্যের রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছেন। তাঁর কবিতার ভাবসংহতি ও অনমনীয় পৌরুষ তরুণতর কবিদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'যৌবনবন্দনা', তাঁর তন্ত্রধর্মী দেহবাদ—'ভুলেছি আত্মার কথা মানি শুধু দেহের সীমানা'—সে যুগের তরুণতর আধুনিক কবিদের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁক কবিতার Eternal Passion ও Eternal Pain—জীবন, মৃত্যু, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তুলে ধরেছিলেন। কল্লোলের কবিরা এতে মুগ্ধ হলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'মোহিতলালের জীবনবোধে যে তীব্রতা "অক্ষম হাতে শুধু উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছাসে অপব্যয়িক হতে পারত", তা তাঁর হাতে "সুতীব্র অথচ শাসিত স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে।" "ইন্দ্রিয়গোচর মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ" তাঁর মতো সুনিপুণভাবে কেউ পরিবেশন করতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে সোভিয়েত সমাজ বিপ্লব। এর ফলে মানুষ ও মানব সমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটেছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় লেখকদের রচনাবলি তরুণ লেখকদের মনে ভাঙাচোরা পরিবার সমাজজীবনে নানা দুর্যোগ দুর্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। জনসমাজ জনজীবন তরুণ কবি সাহিত্যিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করছিল। কল্লোল-কালিকলম উত্তরা-প্রগতির কবি গোষ্ঠী এই সমস্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই তাঁদের রচনা প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়েছিল। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি এই সময়ের রচনা। ওদিকে 'পরিচয়' পত্রিকার আবহাওয়ার লালিত সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে প্রভৃতি সকলেই ১৯০০—১৯১০-এর মধ্যে জন্মেছেন। প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব-এর প্রবণতাগুলিকে যদি সূত্রায়িত করা যায় তবে বলা যেতে পারে প্রথমোক্ত জন যদি হন হুইটম্যানীয় আদর্শে সমাজসচেতন, দ্বিতীয় নির্জন, নিঃসঙ্গ, প্রেম ও প্রকৃতিচেতন আর বন্দির বন্দনায় কবি দেহজ প্রেমের তীব্র আকুলতায় কাতল। 'পরিচয়ের' কবিরা এদিক থেকে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র চরিত্রলক্ষণযুক্ত এবং অনেক অংশেই মননশীল মার্জিত বৌদ্ধিক।

কল্লোলের প্রথম পর্যায়ে (১৯২৩-১৯৩০) প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪—১৯৮৮) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। 'প্রথমা'র (১৯৩২) কবিতায় তিনি কখনো বহুলোকের মিলিত অনুভবকে, কখনো বা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবকে সঞ্চারিত করেছেন। এখানে কবির স্বপ্নভাঙা প্রাণের পরম বেদনা বোধের পরিচয় আছে। তাঁর ব্যক্তিমানস যেমন দুর্গম পথ সন্ধান করেছে, তেমনি সভ্যতার বিবর্তনেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কবিকণ্ঠ ছিল অব্যর্থ।

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি। প্রেমের কবিতাতেই তাঁর কবিত্ব শক্তির পূর্ণ পরিচয়। তাঁর কাব্য সাধনার শুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে।

'মর্মবাণী' (১৩৩১) কাব্যগ্রন্থে সে পরিচয় আছে। তিনি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রানুসরণে নতুন যুগ ভাবনার প্রকাশ সম্ভব নয়, তাঁদের কবি মানসেরও মুক্তি নেই। অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের "কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক। সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।" বুদ্ধদেব প্রেমের কবি। এ প্রেম মূর্ত, শরীরী 'প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী, দেহজ কামনার শাপে নিরন্তর দগ্ধ।' কিন্তু বুদ্ধদেব শুধু তাতেই নিমজ্জিত থাকেননি। ইন্দ্রিয় তাঁর কাছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করবার উপায় মাত্র।

বুদ্ধদেবের নায়িকা রক্ত-মাংসের নারী। দেহী বলে তার নামরূপ দিয়েছেন—মৈত্রেয়ী, কঙ্কাবতী। রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'য় বর্ণিতব্য নারী প্রকৃতিকে ধরিয়ে দিতে নাম ব্যবহার করেছেন, তার কোনো শরীরী রূপ দিতে চাননি। 'মানসী', মানসসুন্দরী তো ভাবলোকবিহারিণী। বুদ্ধদেব ও আধুনিক কবিরা রোমান্টিক অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকাকে দেহী রূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে তাদের আরও স্পষ্ট করে তুলতে পদবী যোগ করেছেন—বনলতা সেন, শেফালিকা বোস, অরুণিমা সান্যাল।

পরে প্রৌঢ় পরিণত বুদ্ধদেবকে দেখেছি তিনি জীবনের অমোঘ সত্যটিকে উপলব্ধি করেছেন—জীবনে যেমন সত্য যৌবনের ঐশ্বর্য, তেমনি সত্য যৌবন-কামনা-মুক্ত পরিণত প্রৌঢ়ত্বের নিরাভরণ রূপ। মোহ ও মোহমুক্তি এই দুই নিয়েই মানুষের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। তাঁর শেষ পর্যায়ী কাব্যে—'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮) ; 'শীতের প্রার্থনা', বসন্তের উত্তর', (১৯৫২) ; 'যে আধার আলোর অধিক' (১৯৫৮)-এ সে পরিচয় আছে।

(১৯০১—১৯৮৬) পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকেই সুধীন্দ্রনাথ (১৯০১—১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮০), ও অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—১৯৮৬) কাব্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কবিরা একই সামাজিক পটভূমিকায় বাস করেও স্বতন্ত্র ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাহী হলেও তাঁর কাব্যে ব্যাপক আত্মানুসন্ধানের পরিচয় আছে। একসময় নিজেকে পূর্বগামী কবিদের অনুসারী বললেও, পরে, তাঁর কবিতায় আধুনিক কালের সংহত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রবহমান ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে কবিতার রূপান্তর ঘটান। তিনি তাঁর স্বকীয়তাকে অর্জন করেছিলেন নিখুঁত কারুকৃতির সহায়তার। সাবলীল রচনাকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। সাধারণ পাঠকের কাছে যা স্বচ্ছন্দ, তাকে তিনি চর্বিতচর্বণের নিদর্শন মনে করতেন। একান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সুধীন্দ্রনাথ মানতেন নিরাসক্তি সৎসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ, তাকে আয়ত্ত করাই কাব্যচর্চার হেতু। মননপ্রধান কবি বহু ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন বলেই আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বিষ্ণুদের কবিতা এ কালের পাঠকের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ। ইনিও একসময় রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দরের সাধনায় আগ্রহী ছিলেন। চেয়েছিলেন 'আনন্দ, আনন্দ, শুধু আনন্দ-নিষ্যন্দন আকাশ' কিন্তু বিরোধী পারিপার্শ্বিকতা সম্ভব ছিল না। উর্বশী ও আর্টেমিশ-এ 'ছেদ' কবিতায় বলেছেন,—'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' ফলে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনাজনিত সমষ্টির অঙ্গীকার তাঁর কবিতায় অসামান্য মর্যাদা পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, শান্তির জন্য সংগ্রাম—এ সবের মধ্যেও তিনি কখনো বিশ্বাস হারাননি। তাঁর কাব্য স্বপ্নবাক্, ভাবগম্ভীর, দেশি প্রতীক ও চিত্রকল্পের পাশাপাশি বিদেশি প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে সমৃদ্ধ। তাঁর কবিতার ভাষা বিন্যাস ও প্রয়োগ কৌশল অনেক সময় একটু জটিল কদাচিৎ তাঁর কবিতার বিষয় ও ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে একটু দুরূহ বলে মনে হতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিক চিন্তাভাবনা, নতুনতর আঙ্গিকে ও ভঙ্গিকে রচিত কবিতা প্রথম থেকেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। তাঁর কবিতা আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা সহজ মনে হলেও, সেটি ঠিক নয়। বরং বলা যায় তাঁর কবিমানস অনেকটা জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত। তাঁকে মনে হতে পারে অনেকটা আধ্যাত্মিক বা মিস্টিক বা মরমিয়া চেতনার উত্তরাধিকারী, বস্তুত এটি তাঁর এক ধরনের ছদ্মবেশ। "নিস্তরঙ্গা সমুদ্রের তলায় যেমন লুকিয়ে থাকে মগ্ন শৈল ও ঘন অরণ্য, ঘূর্ণাবর্ত ও জলচর জীবের বিক্ষোভ, তেমনি ধ্যানগম্ভীর 'সঙ্গতি'র কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্ব জর্জর আধুনিক মানস—সমন্বয় যার কাম্য" অথচ যাকে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিমানসের বিবর্তনের প্রথম স্তরে বস্তু ও চেতনার মধ্যে ঐক্যকে দেখেছেন, পরে উপলব্ধি করেছেন বিজ্ঞান ও বস্তু চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল রহস্যকে উপলব্ধি করা যায় না। "বাহিরের সকল ঘটনার তাৎপর্য, সকল বিরোধের সঙ্গতি, সকল বৈষম্যের ঐক্য নিহিত আছে কবির ধ্যানে।" তাই যা দেখা যায়, তাই সব নয়—অর্থাৎ "দৃষ্টির দর্শন" সব কথা নয়। কাব্যেরও একটি শ্রেয়তা আছে, তা সমাজ-নিরপেক্ষ, সংসারের সুখ দুঃখ থেকে ভিন্ন—তাকে ধ্যানে উপলব্ধি করতে হয়। কাব্য এভাবে অমিয় চক্রবর্তীকে সমাজ থেকে দর্শনে পৌঁছে দিয়েছে। ফলত তাঁর কবিতায় দৃষ্টির জগৎ ধ্যানের জগতের বিরোধ বেধেছে—কবির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আছে তাঁর কবিতায় বিশ্বপথিক কবির এক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পরিচয়। উপসংহারে বলা যায় অমিয় চক্রবর্তী বস্তুবিশ্ব-সমাজদর্শন-বিশ্বদর্শন-এ নিয়ত পারাপার করে যে প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন, তা তাঁর কবিতাতে জটিল করেছে। কবিতার ভাষাকে আপাত বিশৃঙ্খল, ব্যাকরণকে ভেঙেচুরে তাতে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছন। বলা যায় তাঁর রচনারীতিতে সৃষ্টিশীল বিশৃঙ্খলার—(Creative violence)-এর সুস্পষ্ট ছাপ আছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা চেতনাসমৃদ্ধ সৃষ্টিশীল প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দের আবির্ভাব। জীবৎকালে বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কিছুটা সমাদর পেলেও তাঁর কবিমণীষা মৃত্যুর পর যেভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, প্রথম শ্রেণির কবি প্রতিভার মর্যাদা পেয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পাননি। জীবনানন্দের জীবনবৃত্ত ও কাব্যকথা প্রসঙ্গে সেটি আলোচ্য।

৫১.৩ জীবনানন্দ দাশ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, বরিশাল শহরে। তাঁর পূর্বপুরুষরা এক সময় ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 'গাউপাড়া' গ্রামে বাস করতেন। সেটি পরে পদ্মার ভাঙনে লুপ্ত হয়েছে। পিতামহ সর্বানন্দ প্রথমে পড়াশুনা পরে চাকরিসূত্রে বরিশালে স্থায়ী হন। সর্বানন্দ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যানন্দ বাবার ইচ্ছায় কলকাতার সিটি কলেজে পড়ে প্রথমে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সত্যানন্দের স্ত্রী কুসুমকুমারী ব্রাহ্ম চন্দনাথ দাসের মেয়ে। বেথুন স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়বার সময় তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরেও তিনি কাজের ফাঁকে লেখাপড়া করতেন, কবিতা লিখতেন। দুই ছেলে—জ্যেষ্ঠ জীবনানন্দ, কনিষ্ঠ অশোকানন্দ, বোন সুচরিতা দাশ। শৈশবে ভোরে উঠে বাবার উপনিষদ আবৃত্তি, মায়ের গান শুনতেন। পরিচারক-পরিচারিকাদের কাছে গল্প-গাথা-ছড়া শুনতেন ; গাছ, পাখি লতা পাতা এদের কাছে চেনা। ১৯১৫ তে ব্রজমোহন স্কুলে থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ব্রজমোহন কলেজে আই.এ. (১৯১৭), পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক ইংরেজি সহ বি. এ. (১৯১৯)

এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১-এ এম.এ. পাশ করে সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু (১৯২২), কলেজের অর্থ-সঙ্কটে কনিষ্ঠ অধ্যাপক জীবনানন্দের কর্মচ্যুতি (১৯২৮)। বৎসরাধিককাল টুইশন নির্ভর বেকার থাকার পর ১৯২৯-এ মাস তিনেক খুলনার বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে পড়ান। ওই বছরের ডিসেম্বরে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে বরিশালের অশ্বিনী দত্ত-র ভাইপো সুকুমার দত্ত কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩০-এর ৯ই মে খুলনার সেনহাটি গ্রামের রোহিণী গুপ্তের কন্যা লাবণ্য দেবীকে বিয়ে করেন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে। শোনা যায়, রামযশ কলেজ বিয়ের জন্য ছুটি দিতে চায়নি, তাই তাঁর আর ফিরে যাওয়া হয়নি। প্রায় বছর পাঁচেক বেকার ছিলেন। মাঝে কিছুদিন জীবন বিমার এজেন্ট-এর কাজ করেছেন। কিছুদিন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসাও করেছেন। জীবনধারণের একমাত্র উপায় গৃহ শিক্ষকতা—এই সুদীর্ঘ অন্ধকারের দিনের পরিচয় পাওয়া যায় এ সময় রচিত কবির কতকগুলি গল্প ও তিনটি উপন্যাসে। যার সন্ধান কবির জীবৎকালে মেলেনি। অবশেষে কবি ১৯৩৫-এ বরিশাল-এ ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির স্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। টানা এগারো বছর সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। মাঝে ১৯৪৩-এ একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসে বেড়িয়ে গেছেন। ১৯৪৬-এ দেশ বিভাগের বেশ কিছুদিন আগে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন, আর ফিরে যাননি। বছর দুয়েকের জন্য আবার বেকার। মধ্যে কয়েকমাস সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চেষ্টায় 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকার রবিবারের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনা ভার পান। সে বছরের শারদ সংখ্যাও সম্পাদনা করেন। এরই মধ্যে স্পষ্ট হল সাংবাদিকতা তাঁর ধাতে নেই। ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি ছেড়ে দেন। এরপর বিজ্ঞাপন দেখে চাকুরি দরখাস্ত, বন্ধুদের কাছে আরজি জানানো। প্রায় আড়াই বছর বেকারিত্বের পর ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে খড়গপুর কলেজে চাকরি পান। সেখানে হোস্টেলে থাকতেন আর সুযোগ পেলেই চলে আসতেন কলকাতায়। নানা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত জীবনানন্দ এ সময় দুশ্চিন্তাপ্রবণ হয়ে পড়েন। স্ত্রী বি. টি. তে ভর্তি হয়েছেন। বলা যায় সংসার তাঁরই ঘাড়ে- তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবিও প্রায়ই ছুটি নিয়ে কলকাতায় থাকেন, অবশেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে চাকরি ছাড়েন। আবার বেকারি, আবার চাকরি খোঁজা। ১৯৫১ তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রিসার্চ এসিস্টেন্টের জন্য এবং চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা, অস্থায়ী ব্যবসা, আর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সুপারিশে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৫২ তে লাবণ্য দাস বি.টি. পাশ করে স্কুলে চাকরি পেলে প্রাথমিক সমস্যা মেটে বটে কিন্তু উদ্‌বেগ কমেনি।

১৯৫২-র নভেম্বর থেকে ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার মাস বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে লিভ ভ্যাকেন্সিতে অধ্যাপনা করেন। কাগজ দেখে আবেদন পত্র পাঠিয়ে ১৯৫৩ মার্চে ফকিরচাঁদে কলেজ, ডায়মণ্ডহারবারে, গোপাল রায়ের সুপারিশে চাকরি হলেও সাংসারিক অসুবিধার কারণে যোগ দিতে পারেননি, ফলে টুইশন নির্ভরই জীবনই চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৩-র মাঝামাঝি উক্ত শ্রীরায়ের চেষ্টাতেই অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা পেলেন, সেখানেই আমৃত্যু চাকরি করেছেন। ইত্যবসরে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের তৎপরতায় ডি. পি. আই পরিমল রায়ের সাহায্যে এবং রাজ্য সরকারের এবং দিল্লির একটি কলেজে চাকরির সুযোগ এসেছিল, জীবনানন্দ যেতে চাননি। কলকাতায় এসময় কবি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সহকর্মী ও ছাত্রীদের কাছ থেকে যেমন তেমনি কবি হিসেবেও ব্যাপক প্রীতি সমাদর ও মর্যাদা লাভ করছেন। কবিমহল ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবর্ধিত 'বনলতা সেন' ১৯৫২ তে সিগনেট প্রেস

প্রকাশ করে। গ্রন্থটি নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ১৯৫৪ জানুয়ারিতে সিনেট হলের কবি সম্মেলনে কবি স্বরচিত পড়ে শোনালেন। এ বছরই ১৩ই অক্টোবর বেতারকেন্দ্রের কবি-সম্মিলনে কবিতা পড়লেন। ১৪ই অক্টোবর বিকেলে অন্যমনস্ক কবি রাসবিহারী ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে ট্রামে চাপা পড়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি হলেন। সেভাবেই কয়েকদিন কাটল, শেষে সেপটিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪র ২২শে অক্টোবর রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাব্যকথা—জীবনানন্দ শৈশবের মায়ের কাছে কাব্যচর্চার প্রেরণা পেয়েছেন। মা কুসুমকুমারী সংসারের কাজের ফাঁকে কাব্যচর্চা করতেন। স্বভাবকবির নৈপুণ্যে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। 'ব্রহ্মবাদী', 'মুকুল', ও 'প্রবাসী'তে তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বাবা সত্যানন্দ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদী' সম্পাদনা করেন। এখানেই জীবনানন্দের 'বর্ষা আবাহন' শীর্ষক কবিতা এপ্রিল ১৯১৯ (বৈশাখ ১৩২৬) প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সদ্য বি. এ. পাশ করেছেন। কবিতাটির কোন অসামান্যতা ছিল না। পরে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে "দেশবন্ধু প্রয়াণে" বঙ্গবাণী'তে, এবং অন্যান্য কবিতা কল্লোলে, প্রবাসী, ধূপছায়া, বিজলী, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা ৫৯৯টি (দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ কাব্যসংগ্রহ)।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঃ 'ঝরা পালক' (১৩৩৪), পুণর্মুদ্রণ (১৩৭৯),

২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৩৪৩), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ;

৩. 'বনলতা সেন' (১৩৪৯), কবিতা ভবন সংস্করণ ; দ্বিতীয় সংস্করণ সিগনেট, (১৩৫৯) ;

৪. 'মহাপৃথিবী' (১৩৫১), পূর্বাশা সিগনেট সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৫. 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৬. 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৬১), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ; তৃতীয় সংস্করণ (১৩৬৭), চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭০), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৩) দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ (১৩৯০),
তারপর এ পর্যন্ত প্রকাশিত—

৭. 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), দেবেশ রায় সম্পাদিত সং (১৯৮৪) ;

৮. 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৬৮) ;

৯. 'সুদর্শনা' (১৩৮০), ইং (১৯৭৩) ;

১০. 'মন বিহঙ্গম' (১৩৮৬), ইং (১৯৭৫) ;

১১. 'আলো পৃথিবী' (১৩৮৮), ইং ১৯৮১ প্রভৃতি।

প্রকাশক ঃ শ্রী গোপাল রায়, সাহিত্য সদন। এই গ্রন্থত্রয়ী তালিকাবদ্ধ হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা) 'জীবনানন্দ' পুস্তকে।

৫১.৪ মূলপাঠ — ১ ঃ বনলতা সেন

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হায়ায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেল পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

৫১.৫ সারাংশ — ১

অনেক আবেগ আকাঙ্ক্ষা আকুলতা নিয়ে অন্বেষায় স্বপ্ন যখন ক্লান্ত, পথকে মনে হয়েছে দূরপ্রসারী, জীবনের চারিদিকে সফেন সমুদ্র উদবেল হয়ে উঠছে কিন্তু হাঁটার শেষ হয়নি — সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগর পর্যন্ত — বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ পেরিয়ে সুদূর বিদর্ভ নগরে হালভাঙা দিশেহারা নাবিকের কল্প জগতের সন্ধানে, এমনই সময় মিলেছে দুদণ্ডের শান্তি —

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলেছে সে
এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

আতপ্ত হৃদয় অবশেষে দিনের শেষে, সন্ধ্যা নামে জোনাকি জ্বলে, সেই অন্ধকারে সব কাজ সেরে মুখোমুখি বসবার অবকাশ পায়।

৫১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম প্রকাশ 'কবিতা' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৪২এ) মোট ১২টি কবিতা নিয়ে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে এটি সংকলিত হয়। 'কবিতা ভবন' প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রকাশ পৌষ ১৩৪৯ ইং ডিসেম্বর ১৯৪২। গ্রন্থটি প্রকাশমাত্র নামকবিতা সহ কাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করেন। 'কবিতায়' বুদ্ধদেব বসু ও 'চতুরঙ্গে' আবুল হোসেন চৈত্র, ১৩৪৯ ; 'একক'-এ শুদ্ধসত্ত্ব বসু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'নিরুক্ত', আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায় কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে 'বনলতা সেন' কবিতা সম্পর্কে তাঁর কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'জীবনানন্দের কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত। দূর দেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশ-বিহারী, কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত। জীবনানন্দের জগৎ সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন। ..... তাঁর কাব্য বর্ণনা বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল। তাঁর কবিতা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তবে, প্রথমে দৃষ্টি, পরে স্পর্শ। তাঁর মন স্বভাবতই দৃশ্যবিলাসী ও স্পর্শ পিপাসু। .....জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "উপমাই কবিত্ব।" তাঁর কবিতায় উপমার ছড়াছড়ি। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দুরবগাহ। — কোন অভিনব বিশেষণ, কিংবা পুরানো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্য পদের রূপক প্রয়োগ — এ সমস্তই তো উপমা। — জীবনানন্দ যখন বলেন — বলেছে সে, "এতদিন কোথায় ছিলেন ?"

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। — তখন বোঝা যায় কবির মন কীভাবে কাজ করেছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ এ সমস্তই যে কোনো সর্বদেশ কালব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি করে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

আবুল হোসেনের বক্তব্য — জীবনানন্দ একান্তভাবেই বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক। রবীন্দ্র ঐতিহ্যমুক্ত হয়েও, তিনি একান্তরূপেই রোমান্টিক। ভাবকে তিনি কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি কি চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। ..... কবির কাব্যের প্রাণ হল অদ্ভুত মিশ্রণে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের। পুরোনোর সঙ্গে নতুনের। অসম্ভবে-সম্ভবে এসে দেখেন নাটোরের বনলতা সেনকে সে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলে "এতদিন কোথায় ছিলেন ?" আকস্মিক বিস্ময়ের বিদ্যুৎ স্পর্শের শিহরণ সঞ্চারিত হয়। এটাই জীবনানন্দের টেকনিক। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মতে 'বনলতা সেন' বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অমর সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের পর এত সুন্দর ও সার্থক রোমান্টিক কবিতা আর সৃষ্টি হয়নি বলা যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন জীবনানন্দ ইয়েটস-এর মতো অতীত জগতে আর স্বপ্নের বস্তুতে সৌন্দর্য খুঁজে পান। বনলতা সেন-এ এমন একটি জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে যেখানে হৃদয়ের ইচ্ছা আর অনুভূতির ও কল্পনার উল্লাস তৃপ্তি পেতে পারে। কবির প্রেম কাতর হৃদয় অতীতের সমস্ত মোহ যেন এখানে প্রকাশ পেয়েছে— তাঁর অন্তহীন প্রেমানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'বনলতা সেন'-এ—

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য ..... ।" — নাটোরের একটি সাধারণ নারীকে — কবির প্রেমানুভূতি

কারুকার্যখচিত করে তুলেছে। কবির আবেগের যেন কাব্যময় প্রতীক সে। বনলতা সেন' প্রেমের নিবিড়তায় মূর্ত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। যে রূপ জীবনানন্দ সৃষ্টি করেন আবেগের তাড়নায় তা শুধু দৃশ্যের বিষয়ীভূত নয়, তা উপলব্ধিরও—এখানেই জীবনানন্দের স্বচেতন স্বকীয়তা।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পর্বে কবিও কবিতা পত্রিকার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হল। তিরিশের দশকে যে কবির কাব্যযাত্রা শুরু প্রায় এক দশক পরে তার প্রাথমিক স্বীকৃতি লাভ ঘটল। এই বিলম্বিত স্বীকৃতির কারণও যে স্বয়ং জীবনানন্দের—তাঁর অন্তর্মুখী গহন মন, গভীরতর ভাবানুভূতি, তাঁর অভাবনীয় কল্পনার ঐশ্বর্য, শব্দ নির্বাচন ও চিত্র রচনার বিস্ময়কর ক্ষমতা। তাই 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিচার বিশ্লেষণে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি এক সময় কাব্যালোচনার আসরে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেউ কেউ একে কবির শ্রেষ্ঠর রচনা বলেছেন।

তিন স্তবকে ১৮ ছত্রে রচিত কবিতাটি কতকগুলি অপ্রত্যাশিত শব্দযোজনায় এমন একটি অসামান্য কাব্য শিল্প সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটির আরম্ভ 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'—যেন কোন দূরাগত কল্পনার জগতে জীবনের আভাস নিয়ে এসেছে—এই নিরন্তর চলার মধ্যে ইতিহাস-ভূগোল ছাড়িয়ে কিছু আছে। কিন্তু কবিতা কবির অনুভব থেকে সৃষ্ট—এর উৎস, আদি-অন্ত্য সন্ধান দূরবগাহ। তাই সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর বিম্বিসার অশোকের বস্তু জগৎ থেকে কল্পনা ব্যঞ্জনার্থ সন্ধানই স্বাভাবিক। এ থেকে একটি দেশে ও কালে ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ জগতের যখন আভাস আসছে, তার মধ্যে অকস্মাৎ কোনো পরিচয়হীনা নাটোরের বনলতা সেন, যার প্রসঙ্গ টেনে তারই কাছে জীবনের সফেন সমুদ্রে ভাসমান নিদারুণ অস্তিত্বের ভারে ক্লান্ত প্রাণের দুদণ্ড শান্তি পাওয়ায় সংবাদ—বস্তুত, সেই রমণীয় অসামান্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপস্থাপনার অভিনবত্বে নাটোরের বনলতা সেন কাব্য রসিকের কাছে হেলেন বা বিয়াত্রিচের মতো চিরকালের একটি স্মরণীয় প্রতিমা হয়ে আছে।

কবিমানসী সম্পর্কে আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা মনোলোকের বাসিন্দা, অদেহী—প্রকৃতির বিচিত্র মহিমায়—সন্ধ্যার রক্তিম বর্ণে, ঊষার কনক স্বর্ণে, নীল আকাশের নীলিমায়-স্বপনচারিণী। বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-বিষ্ণুদের কাছে তারা শরীরী রক্তমাংসের নারী—তাই তাদের নাম রূপ আছে—এমনকী জীবনানন্দে গাঁই গোত্রটি পর্যন্ত—নাটোরের বনলতা সেন। রোমান্টিক প্রেমের অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকা এখানে দেহী এবং ভৌগোলিকতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই পরবর্তী স্তবকেই তাঁর একটি বর্ণনা পাই। বনলতার উপস্থাপনা পর্বে—তাঁর দুদণ্ডের শান্তি দেওয়ার জন্য যে প্রশান্ত মাধুর্য পাঠক উপলব্ধি করেছে, তাতেই অনুভব করা গিয়েছে তার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের আকর্ষক ও পরম রমণীয়তা। কবির দেওয়া বর্ণনায় জানা যায় কবি কী করে তিলে তিলে তাকে সৃষ্টি করেছেন—শব্দকে কত সহজে ব্যবহার করে একটি অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করা যায়। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য। কালিদাসের কল্পনা সৃষ্টি সৌন্দর্য জগতের সেই অস্পষ্ট কল্প জগতের বিদিশার অন্ধকার রাত্রির থেকেও কালো যাঁর চুল, মুখ যাঁর প্রাচীন ভাস্কর্যকলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো—এমনই একজন বনলতা সেন। এই উল্লেখেই পাঠক কবির সঙ্গে কবি অনুভূত সৌন্দর্য জগতে বিচরণ করে এমন কোনো এক রমণীয় রূপকে কল্পনা করেছেন যা ইতোপূর্বে কেউ করেনি। জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে যেন এক অপ্রত্যাশিত জগতের আরও এক অপ্রত্যাশিত নারীর সন্ধান দিলেন, যা ছিল এতদিন একেবারেই অভাবনীয়। বনলতা সেন, তাই এক সচকতি-করা কবিতা। আজও বনলতার চোখের বর্ণনা—'পাখির নীড়ের মতো চোখ'—শুধু একটি চিত্রকল্প নয়, তা যেন গভীরতর ব্যঞ্জনায় সঞ্চার করে অন্তর্লোককে আচ্ছন্ন করে। এদিক থেকে পাখির নীড় শুধু নীড় নয়, পাখিদের ক্লান্তি

অপনোদন ও শান্তির নীড়। সেই বিশ্রান্তি ও শান্তির আশ্বাস আছে বনলতার চোখে—সে চোখ আশ্রয় দেয়, ক্লান্তি অপনোদন করে, শান্তি দেয়। উপমাটি এদিক থেকে সার্থক। কবিতাটি এখানেই শেষ হয়নি। এরপর জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে আপাত বিষাদময় গোধূলির এক নিঃসঙ্গ জগতে নিয়ে গেছেন—"সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী"—এই প্রত্যাবর্তনের বার্তা মাত্র দুটি শব্দে বিধৃত হলেও, এর গভীরতা সুদূর প্রসারী। কবি কবিতার প্রথমেই কাল স্রোতের প্রবহমানতার ইঙ্গিতের (হাজার বছর ধরে পথ হারায়) সঙ্গে চিরন্তন নিঃসঙ্গতার সহজ সত্যের আভাস দিয়েছেন, তা দ্বিতীয় একটি ঘটনার পটভূমি রচনা করেছে। 'সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন'—জীবনের দুকূল বেয়ে চলার নদী বা কালপ্রবাহের পরেও অবশিষ্ট থেকে যেটুকু সময়, সেটিই তো কবির কল্পজগৎবাসিনী কবি মানসীকে একান্ত আপন করে পাবার মুহূর্ত — "মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"—বনলতা সেন তারই মূর্ত প্রতীক। বনের লতা যেমন চির শ্যামলতার প্রতীক তেমনি বনলতা সেনও মানবীয় সৌন্দর্যের দীপ্তিময় প্রকাশ—সে ক্লান্তিহারী শান্তির নিশ্চিত আশ্রয়। এদিক থেকে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু কবিতাটির কোথাও বনলতাকে প্রিয়া সম্বোধন বা কল্পনা করা হয়নি—কবির আচরণেও তার আভাস নেই। তাই কবিতাটিকে বলা যায় নির্বিশেষে প্রেমের কবিতা—নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নয়, পারস্পরিক আকর্ষণ এই কবিতাটিকে অনেকটা রহস্যময় করেছে।

কোনো কোনো সমালোচক এজন্য বনলতা সেন কবিতায় মহাসময়ের সঙ্গে মহাজীবনের অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জীবনকে দেখেছেন। তাঁদের মতে কবি যেমন বর্তমান সময়গ্রন্থিতে নিবিষ্ট, নাটোরের বনলতা সেন তেমনি আছেন। এতে যেমন অন্ধকার অতীত ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ মাঝে দুদণ্ডের শান্তির বর্তমান—কিন্তু সেও অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই মিলন মুহূর্তেই বলেছে—'এতদিন কোথায় ছিলেন ?' ইতিহাসের অতীতের জীবনবোধের যে কল্পছবি কবির মনে ধরা পড়েছে, তা-ই তিনি দেখতে পেয়েছেন নাটোরের বনলতা সেন ও যাঁর 'চুল .... কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার' মতো, তাঁর মুখ যেন "শ্রাবস্তীর কারুকার্য"। কালপ্রবাহে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একাকার হওয়ার কথাই এ কবিতার কথা — মনে করেছেন কিছু সমালোচক। এভাবে কবিতাটিকে চিরন্তনের সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছে বনলতা সেন। অপর সমালোচক ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু এই কালচেতনার মধ্যে ইতিহাসবোধ, ইতিহাস চেতনাকে অধিকার করেছেন। তাঁর ভাষায়—"কবি তাঁর মানসপরিমণ্ডলে প্রেম হোক আর প্রকৃতি হোক, কিম্বা জীবনের বিবিধ বোধের ব্যাপারই হোক, কালজ্ঞান এবং ইতিহাস চেতনার বেধ ও পরিধিতেই তিনি তার রূপদান করতেন।"

তাঁর প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও ইতিহাসচেতনার সঙ্গে ভৌগোলিক পরিসরের ব্যাপ্তিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বনলতা সেন' কবিতায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে—"এমন কি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষ জীবন-সংগ্রামে নিরত থেকেও নারীর প্রতি ভালোবাসা থেকে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকেনি। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ হাঁটার প্রতীকতায় সেই চেতনাই উদ্ভাসিত হয়েছে। অতীতের শ্রাবস্তীপুরীর শিল্পী নিজ অন্তরের সংবেদনশীলতায় যে প্রতিমা নির্মাণ করেছেন—সেই মমতার প্রতিচ্ছবি বনলতা সেনের মুখে। একবার সিংহল সমুদ্র, পরমুহূর্তেই মালয়-সাগর, বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগৎ থেকে অবশেষে বর্তমানে নাটোরের বনলতা সেনকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে কালচেতনার কথা বলেছেন—"কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা এবং মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" এই ইতিহাস চেতনাও কালজ্ঞান কবির মনোলোককে উদ্বেল করলেই, তিনি ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই "অপরিহার্য সত্যটি" তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই কারণেই তিনি তাঁর নায়ক নায়িকার নামের সঙ্গে উপাধি বসিয়ে বাস্তববোধ সঞ্চার করে তাঁদের প্রত্যক্ষগম্য করে তুলেছেন। এজন্যই তিনি অনায়াসে অতীতের শ্রাবস্তী থেকে বর্তমানের নাটোরের মুহূর্তে পাড়ি জমাতে পেরেছেন। জীবনানন্দের কল্পনার এই অভাবনীয় ব্যাপ্তি প্রসৃত সময়সীমা ও ভূগোলচেতনার এই বিস্ময়কর ও অভিনব সমীভবনের জন্যই তাঁর পাঠকদের চমকিত করেছে।

জীবনানন্দের কবিতায় শুধু কাল-ইতিহাস-কল্পনার কথাই বা বলি কেন, তাঁর প্রকৃতিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখবার, উপভোগ করবার ও পাঠককে সেই অনুভূতির অংশীদার করবার জন্য অসাধারণ সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু চোখ দিয়ে প্রকৃতির রূপ মাধুরী দেখেননি, কান দিয়ে তার ধ্বনি মাধুর্য শুনেছেন, মন দিয়ে তিনি ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুকে অনুভব করেছেন। এভাবে তাঁর রোমান্টিক অনুভূতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়ের বস্তু অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। যেমন, আলোচ্য বনলতা সেন কবিতার তৃতীয় স্তবকে 'শিশিরের শব্দ' 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ'। সাধারণ অভিজ্ঞতায় ভাবা যায় না। রোদের বর্ণ নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয় হলেও, গন্ধ তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের। কিন্তু কবি তাঁর তীব্র ও গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে রৌদ্রের ঘ্রাণ উপলব্ধিগম্য করে নিয়েছেন। এখানেই ফুটে উঠেছে কবির ইন্দ্রিয় সচেতনতা—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় sensuousness বা ইন্দ্রিয়ঘনত্ব। এরকম আরও অনেক উদাহরণ জীবনানন্দের কবিতায় পাওয়া যায়—'ঘুমের ঘ্রাণ', 'বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ'।

জীবনানন্দ কাব্য শরীর সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কৌশল, পদবিন্যাস, উপমা ব্যবহার বাকপ্রতিমার রূপনির্মিতিতে তিনি একক ও অনন্য। নিজের ভাষা বলয়ে তিনি বার বার আবৃত হয়েছে। তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের পাশাপাশি অপ্রচলিত শব্দ, গ্রাম্যশব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। কাব্যের কায়াগঠনে এরা দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এক আশ্চর্য মায়াময় জাদু সৃষ্টি করেছে। শেষের দিকে জীবনানন্দের সমাজ সচেতনতা এবং বাস্তববোধ সম্পর্কিত কিছু কবিতায় বিক্ষিপ্ত চিন্তার ভাবজনিত কারণে অতি দ্রুততায় চিত্র থেকে চিত্রান্তরে গিয়েছেন। ফলে কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ অসংগতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'বনলতা সেন' এদিক থেকে একটি নিটোল শিল্পরূপময় কবিতা। এ কবিতার কোন শব্দই দুরূহ বা নতুন নয়। কোথাও কোনো শব্দকে নিয়ে কষ্ট কল্পনার অবকাশ নেই। চিত্ররচনায় অনন্য ও অসামান্য এক শিল্পিত মননের পরিচয় আছে। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ', 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর', 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ যে চিত্র তুলে ধরেছে। তা শব্দার্থকে অতিক্রম করে নতুনতর ব্যঞ্জনায়, অন্যতর ভিন্নতর অর্থ দ্যোতনা করে। এবং সেটি মন ও অনুভূতি নিয়ে বোঝবার বিষয়। এ না হলে নিছক অভিধানের শব্দার্থ দিয়ে এর মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। জীবনানন্দের ছত্র—'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' বা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—ধ্বনি সুষমা তাঁর রোমান্টিক মনটিকে তুলে ধরবার সঙ্গে, পাঠকের চৈতন্যের গভীরে সাড়া দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

ছন্দ ব্যবহার জীবনান্দ মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেই অনেকটা স্বচ্ছন্দ। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি ৮ + ৮ + ৬ মাত্রার তিনটি পর্বে ২২ মাত্রার ছত্রে বিন্যস্ত করেছেন।

হাজার বছর ধরে / আমি পথ হাঁটিতেছি / পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে / নিশীথের অন্ধকারে / মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ;/

এর মিলের ক্ষেত্রেও কিছু অভিনবত্ব আছে। মিলবিন্যাস মূলত একান্তরিক, অর্থাৎ প্রথম স্তবকে প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠে দ্বিপদী মিল। দ্বিতীয় স্তবকে অনুরূপ মিল থাকলেও ছত্রের মাত্রা বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। তৃতীয় স্তবকেও মিল একই রকম তবে ছত্রের মাত্রাবিন্যাস ভিন্নতর।

অলঙ্কার প্রয়োগে উপমা কালিদাসস্য-র পর বোধ কবি জীবনানন্দের কথা বলতে হয়। "উপমাই কবিত্ব"—এ কথার কথক-এর কয়েকটি উদাহরণ 'বনলতা সেন' থেকেই দেওয়া হল ঃ

* "ডানায় রৌদ্রের গন্ধ"
* "চুল তার কাব্যের অন্ধকার বিদিশার নিশা"
* "বলেছে সে — এতদিন কোথায় ছিলেন ?

পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

দুটিই লুপ্তোপমার উদাহরণ। দুটিতেই উপমান ও উপমেয় থাকলেও সামান্য ধর্ম অনুপস্থিত। দ্বিতীয়টিতে চোখ উপমেয়, পাখির নীড় উপমান, মত সাদৃশ্যবাচক শব্দ কিন্তু সামান্য বা সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই। পাখির নীড় যেমন স্নিগ্ধ ও শান্ত, বনলতা সেনের চোখও তেমনি স্নিগ্ধ ও শান্ত—এটি পাঠককে ধরে নিতে হয়েছে।

যে কোনো মহৎ কবির মতো জীবনানন্দের কবিতার উৎস তাঁর মনে, তাঁর অনুভবে—অন্তর্লোকের রহস্যময় পথে তার জন্ম। এই জন্মের সঙ্গে সহজাত তার শব্দ-ছন্দ-ধ্বনি-অলংকার। এ সবই ভাব ভাবনাকে রঙ, রূপে, রসে প্রকাশের জন্য—অর্থে ও ব্যঞ্জনায়। তিনি জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেছিলেন—প্রকৃতি ও প্রেম হাত ধরাধরি করে তাঁর কবিতায় নানা উপমায় প্রতীকিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কালে কালোত্তরে। 'বনলতা সেন' এ যুগের কবিতা পাঠককে 'প্রথম পাঠ' হিসেবে নতুনতর পথ দেখিয়েছে।

প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ঃ

হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি — হাজার বছর ধরে কোনো মানুষের পক্ষে পথ হাঁটা সম্ভব নয়, তথাপি এ শব্দ গুচ্ছের ব্যঞ্জনায় সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাপ্ত অন্তহীন পরিক্রমা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বাস্তবের সত্য নয়, কবির অনুভবের সত্য। জীবনের সফেন সমুদ্র মন্থন করতে করতে এই অনন্ত যাত্রার জন্যই ক্লান্ত প্রাণ দুদণ্ডের শান্তি প্রত্যাশা করে। অন্বিষ্ট সেই অধরা ভাবের যদি মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ হয় বনলতা সেন, তার পক্ষেই সে শান্তির আশ্রয় দেওয়া সম্ভব।

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক — ক্লান্তি ও মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দের মতো এ যুগের অনেক আধুনিক কবির অন্যতম প্রধান সুর। এই চেতনা অবশ্য সব সময় দৈহিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়নি। যুগের বন্ধ্যা রূপ, অচরিতার্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর উৎসার। রবীন্দ্র-কবিভাবনায় রোমান্টিক হৃদয়াবেগ মানসী, মানসসুন্দরীর ভাব ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হত। আধুনিক কবিরা বস্তুবিশ্বে, ভাব ব্যঞ্জনার পরিবর্তে সব কিছুকেই শরীরী করতে চেয়েছেন, তাই জীবনানন্দও তাঁর কাব্যে প্রধানত বাস্তব সূত্রকে অবলম্বন করে তাকে প্রকাশ করেছেন। অন্তহীন পথ চলার শেষ নেই, তথাপি ক্লান্ত দেহমন-এর ভারাক্রান্ত রূপটি এ ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছেন নাটোরের বনলতা সেন—

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—"বিশেষ লক্ষ্য করতে হবে 'দু-দণ্ড' শব্দ বন্ধ। এই শান্তি

ক্ষণকালীন, কারণ মানুষের যাত্রাপথে আশ্রয়, শান্তি ও স্থিতির ধ্রুব আশ্বাস নিয়ে কোনো বনলতা সেনের আবির্ভাব ঘটেনি। ইতিহাসের কোনো কোনো সিন্ধ লগ্নে চকিত-উদ্ভাসে হঠাৎ কখনও দেখা যায় তাকে, যেমন কবি দেখেছিলেন তাঁর বিশ্বাসী কৈশোরে, নাটোরের কোনো এক বসন্তের ভোরে।"

সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী ফুরায় — এ-জীবনের সব লেনদেন— 'সব নদী' শব্দ যুগ্মের সংকেত একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। দিনান্তে পাখির ঘরে ফেরা, তার শান্তি নীড়ে ফেরা। নদী ফুরায় জীবনের লেনদেন — অংশটির তাৎপর্য হল নদী ও মানুষের জীবন বস্তুত একটি প্রবহমান ধারা — জীবনের লেনদেন মিটিয়ে যেমন মানুষের জীবনাবসান, নদীও তার উৎস থেকে নিরন্তর চলার পর সে মহাসমুদ্রে তার চলার অবসান হয় অর্থাৎ সমুদ্রে লীন হয়ে নদী তার নিজস্বতা হারায়। মানুষও তার জীবনের সমস্ত কর্ম অবসানে, জীবনের সমস্ত দেনাপাওনা সেরে, নীল মৃত্যু উজাগর অন্ধকারে বিলীন হয়।

অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৯৯ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অংশগুলি ভালো করে পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) অনেক ঘুরেছি আমি ; _____ _____ ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে _____ _____,

খ) সমস্ত দিনের শেষে _____ _____ মতন
_____ আসে ; ডানার _____ _____ মুছে ফেলে চিল ;

গ) জীবনানন্দের প্রথম কবিতা _____ প্রকাশ _____ পত্রিকায়, বৈশাখে _____।

ঘ) জীবনানন্দের জন্ম _____ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু _____ খ্রিস্টাব্দে।

ঙ) নজরুলের _____, যতীন্দ্রনাথের _____ এবং মোহিতলালের _____
উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক _____ নিয়ে আসে।

২) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) কবি মোহিতলাল মজুমদারের কবিকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) 'কল্লোল'-'কালিকলম' পত্রিকার সমসাময়িক দুটি পত্রিকার নাম করুন।

৫) 'পরিচয়' পত্রিকার আবহাওয়ায় লালিত তিনজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

৬) বুদ্ধদেব বসুর শেষের দিকের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

৭) জীবনানন্দ স্বল্প সময়ের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেছেন। পত্রিকাটির নাম কী ?

৮) জীবনানন্দের এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা কত ?

৯) 'উপমাই কবিত্ব' কে বলেছেন ?

১০) 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি 'কবিতা ভবন' প্রকাশিত সংস্করণ করে প্রকাশিত হয়েছে ?

১১) জীবনানন্দ কথিত 'কালচেতনা' বিষয়টি একটু বুঝিয়ে লিখুন।

৫১.৭ মূলপাঠ — ২ ঃ বিড়াল

বিড়াল

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় ঃ
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ায় গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে-পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রং-এর সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

৫১.৮ সারাংশ — ২

সারাদিনই একটা বিড়ালের সঙ্গে গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতর, বাদামি পাতার ভিড়ে দেখা হয়। মাছের কাঁটা বা অন্য কিছুতে নিজেকে নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকে। তবুও সে দিনমানে কৃষ্ণচূড়া গাছ আঁচড়ায়। হেমন্তের সন্ধ্যায় অস্তায়মান সূর্যে তাকে খেলতে দেখা গেলেও যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তাকে আর দেখা যায় না।

৫১.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'বিড়াল' কবিতাটির রচনাকাল ১৩৩৬-৪৩ (ইং ১৯২৯-১৯৩৫) প্রকাশ 'কবিতা'য় চৈত্র, ১৩৪৩। বারোটি কবিতা নিয়ে কবিতা ভবন প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় এটি প্রকাশিত হয়, পৌষ ১৩৪৯ (ডিসেম্বর, ১৯৪২-এ) কবি নিজেই এর প্রকাশ ছিলেন। সিগনেট প্রেস-এর দ্বিতীয় পরিচিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫৯ (১৯৫২) তারিখে প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে 'বনলতা সেন'-এর প্রথম সংস্করণের বারটি কবিতা সহ আরও কিছু কবিতা নিয়ে পূর্বাশা প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী' (প্রকাশ ১৩৫১—ইং ১৯৪৪) গ্রন্থে সংকলিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটির প্রথম তিনটি ছত্রে একটি বিড়ালের কতিপয় বর্ণময় সহজবোধ্য চিত্র সংকলন মনে হলেও চতুর্থ ছত্রে পৌঁছে "তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর / নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মত নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি।"—ইত্যাদিকে অকস্মাৎ যেন একটি চিন্তার উল্লম্ফনের মুখোমুখি হতে হয়। পরবর্তী স্তবকে "সূর্যের নরম শরীরে শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা" করা বা ছোটো ছোটো "বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে" আনা প্রভৃতিতে আবার সেই অনুভবের আলো-আঁধারি দেখা যায়।

'বিড়াল' বস্তুত 'সুররিয়ালিস্ট' বা 'পরাবাস্তব' বা 'অধিবাস্তববাদী' কবিতা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি ১৯১৫-১৬ তে প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপের বিধ্বস্ত সমাজজীবনে মূল্যবোধের ভয়াবহ অবক্ষয়, অশান্তি ও বিষণ্ণতার ঘূণ বাসা বাধে। বাণিজ্যিক লেনদেন সর্বস্ব সেই সমাজে হৃদয় বৃত্তির কোনো মর্যাদা ছিল না। মানুষও বস্তুমূল্যে (commodity) বিকোচ্ছে — একটা গোপন হতাশা সর্বত্র দানা বেঁধে ওঠে। ইতোপূর্বে উনিশ শতকে পশ্চিম মহাদেশে অগ্যস্ত কোঁতের 'ধ্রুববাদ', কার্ল মার্ক্সসের 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' চার্লস ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' সনাতন দার্শনিক ঐতিহ্যের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছে। গির্জা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আপ্তবাক্যের বাইরে মানুষ তাঁর অস্তিত্বের নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মানবমনের স্বরূপ বিশ্লেষণ—চেতন, অবচেতন, অচেতন স্তর বিভাজন এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীর উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। সামাজিক পরিবেশ ও বাস্তব জীবন থেকে মানবমনকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ বিশ শতকের প্রথম ভাগে যুদ্ধভীত নৈরাশ্যপীড়িত মানুষের মনে এক ধরনের সমাজবিচ্ছিন্ন প্রবণতার সৃষ্টি করল। ১৯১৭ তে সোভিয়েত বিপ্লবের পর সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার (Socialistic Realism)-এর দাবি উঠেছিল, সেই সমকালেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংকটের প্রেক্ষাপটে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে 'সুররিয়ালিজম' বা 'অধিবাস্তববাদ'। এঁরা শিল্পে সাহিত্যে অবচেতন মনের ছিন্নভিন্ন কল্পনাকে প্রতিফলিত করতে মনোনিবেশ করলেন। এতে অবচেতন মনের প্রাধান্য স্বীকৃত হল। যেহেতু অবচেতন মানসে পারম্পর্য থাকে না, সুবিন্যস্ত চিন্তাপদ্ধতিও থাকে না, সব কিছুই প্রায় এলোমেলো, বিশৃঙ্খল — সেগুলি যে অবস্থায় যেমনভাবেই আসুক না কেন, তাকে সুররিয়ালিষ্টরা যথাযথভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিশৃঙ্খল যুক্তিহীন, অবচেতন মানসের চিন্তালোকের অবিকল উন্মোচনই হল সুররিয়ালিস্ট কবিকর্ম। যেহেতু অবচেতন মনের যুক্তিহীন ভাবনাগুলিকে সজ্ঞান মনের বোধ দিয়ে যুক্তির আলোয় পরিমার্জিত করা যায় না, তাই অধিবাস্তববাদীরা চেতন জগৎ এবং অবচেতন জগতের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা ভেঙে দিলেন। অন্তর্চেতনার জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে কোনো বাধা থাকল না, চেতনলোকের বাস্তব আর মগ্নচৈতন্যের অতিবাস্তব একাকার হয়ে গেল—চিন্তা, কল্পনা এবং স্বপ্নের জগতের একীভবন ঘটল। সাহিত্যে ও শিল্পে এর ফলে এক বিপ্লব ঘটল।

কবি ও পাঠক যেহেতু বাস্তবজগতের অধিবাসী তাই বস্তুবিশ্বের ঘটনাবলির প্রতি তার আকর্ষণ, মগ্নচৈতন্যের স্বপ্নালোকে তার বোধের মধ্যে কাজ করে না, পক্ষান্তরে এই ধারণার বিপরীতে যে শিল্পীরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে মগ্ন চৈতন্যের জগৎ-ই বাস্তব—তাঁদের মতে স্বপ্ন তো বাস্তবেরই একটা জট পাকানো প্রতিরূপ। তাই স্বপ্ন বস্তুবিশ্বের কাছে অপরিচিত বা alien নয়। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে মিল রচনা করাই শিল্পীয় কাজ। ভাষা দিয়ে ভাষাতীতকে ব্যঞ্জিত করাই সুররিয়ালিজমের কবি-ধর্ম। সুরয়ালিজমকে তাই কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন—নিজের মগ্নচৈতন্যে ডুব দিয়ে অবচেতন মনের রহস্য সন্ধান করা। তাই কবি যখন নিজের বোধের সাহায্যে বস্তু ও বিশ্বকে জানেন, নিজের অবচেতন ও মগ্ন চৈতন্যকে জানেন তখনই সুররিয়ালিজমের সৃষ্টি হয়। এরই প্রকাশ যে কাব্যে তাই সুরলিয়ালিস্ট কাব্য।

সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদ ও অধিবাস্তববাদ সমগোত্রীয় না হলেও, তাদের মধ্যে সামান্য মিল দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের কালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা আশার আলো দেখিয়েছিল, সেদিনের সমস্যাজীর্ণ মানুষ এরই মধ্যে আগামী দিনের স্বপ্নোজ্জ্বল সম্ভাবনাকে দেখছিল। আর এ সময়েই একদিকে যেমন সুররিয়ালিজমের প্রথম দলিল প্রকাশিত হয়েছে (১৯২৩) — রবীন্দ্র ঐতিহ্য বিরোধিতার শুরুও এ সময়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কল্লোলীয় কবিদের যে দ্বন্দ্ব তা সবকিছুকে অস্বীকার করবার মধ্যে নয়, অংশত রোমান্টিকের সঙ্গে সুর-রিয়ালিস্ট কবিদের দ্বন্দ্ব। কবি জীবনানন্দ এঁদেরই একজন। পশ্চিমি কবিরা একেই বুঝিয়েছেন — প্রকৃত ও অপ্রকৃত, ধ্যান ও কর্মের মধ্যে সম্মিলন বা 'সুপাররিয়াল' বা 'অধিবাস্তব' সত্তা। জীবনানন্দ ঘোড়া, হাঁস, বিড়ালকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। কবি ১৩৪৫-এর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—"আমি বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধে রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই।" তিনি আরও বলেছেন সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি, তা সম্পূর্ণত কাব্যে থাকে না..... সৃষ্টির ভিতর নানা শব্দে, বর্ণে, গন্ধে মিশে থাকে। একথা একান্তভাবে সুর-রিয়ালিস্ট কবির পক্ষেই বলা সম্ভব।

জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে প্রয়াসী ছিলেন। 'ঝরা পালক'-এর কাল থেকেই তার সূচনা হয়েছে। কল্লোলের বিদ্রোহের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও স্বাধীনতার স্বাদ নিতে চেয়েছেন—

> একদিন শুনেছ যে সুর — / ফুরায়েছে — পুরানো তা — কোন এক
> নতুন কিছুর / আছে প্রয়োজন / তাই আমি আসিয়াছি ; — আমার
> মতন / আর নাই কেউ। (কয়েক লাইন / ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দের কবিতা কতকগুলির ছবির মতো, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'চিত্ররূপময়'। এ ছবি এক ঝলকে প্রকৃতিকে দেখে নিয়ে আঁকা। তাই রং আলো-ছায়া যেটি মনে গেঁথে আছে, সেটি নিয়ে, তার শিল্পরূপময় একটি ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন, ছবিগুলি খণ্ডাংশে বিভক্ত হয়ে গেছে — তা নিয়ে একটি সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি করাই তো সুররিয়ালিস্ট কাব্যের লক্ষ্য। জীবনানন্দ কোনো বস্তুকেই তুচ্ছ করেননি। যে-কোনো প্রাকৃত অপ্রাকৃত বস্তু, দেশজ ও গদ্য গান্ধী শব্দে নিরঙ্কুশ ব্যবহার দৈনন্দিনের মৌখিক শব্দ যেমন ঘাস, বিড়াল প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তিনি সাধারণ লোকায়ত কাব্য থেকেও শব্দচিত্র ব্যবহার করেছেন। তিনি কবিতায় শব্দ ছন্দের অসামান্য অধিকার সত্ত্বেও মিশ্রবৃত্ত বা পয়ার জাতীয় ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন এবং বক্তব্যের প্রয়োজনে কথ্য ও কাব্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

'বিড়াল' কবিতার সূচনা ছত্রটি অথবা "কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে" অনেকটা কথ্য ভঙ্গিতে বর্ণনামূলক বলে মনে হবে, এরই পাশে "হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রং-এর সূর্যের নরম শরীরে" কাব্যরীতি সমান আয়াসে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে কবি অবচেতন মনে যে একটি অন্যতর অনুভব বিরাজ করছে, তা বুঝতে পারা যায়, অকস্মাৎ "তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর" বা "সূর্যের নরম শরীরে সাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা" বা "অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ সচেতন কল্পনার উপকরণ হিসেবে এসেছে। এ সমস্ত কবিতা থেকেই জীবনানন্দকে বাংলা কাব্যের সুররিয়ালিস্ট বা অধিবাস্তববাদী কবিতার প্রবর্তক বলা যায়।

'বিড়াল' কবিতায় বিড়াল প্রাণটির অবতারণা প্রসঙ্গে বাঙালি জীবনে 'বিড়াল'-এর প্রচলিত ভাবানুষঙ্গ একটি বিচার করা যেতে পারে। এই প্রাণীটি বাঙালির ঘরোয়া জীবনের অনেকটা একাত্ম হয়ে গেছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এর সঙ্গে একটি অপ্রাকৃত ধর্মীয় সংস্কার যুক্ত হয়ে আছে। আদিম যৌথ জীবনে জনসংখ্যার একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনে সন্তান কামনা ও তাঁর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় ষষ্ঠী পূজা ও তাঁর বাহন হিসেবে বিড়ালকে মানা হয়েছে। সম্ভবত এক সঙ্গে বহু সন্তান জন্মায় এবং গৃহপালিত বলে সচরাচর অপঘাতে মৃত্যু হয় না বলে বেড়ালকে সন্তানদায়িনী ও রক্ষাকারিণী দেবী ষষ্ঠীর বাহন রূপে গণ্য করা হয়ে থাকবে। দেবমূর্তির বিবর্তনতত্ত্ব অনুসারে আদিতে বেড়ালই যে ছিল আরাধ্য দেবতা পরে নারীমূর্তিধারিণী মাতৃকাদেবী ষষ্ঠীর আবির্ভাব বেড়াল তার বাহনে অবনমনে ঘটেছে বলা যায়। অর্থাৎ এক সময়ে যে প্রাণীটি ছিল গোষ্ঠীগত কুলপ্রতীক, পরে উর্বরতাতান্ত্রিক ধর্মধারা বিকাশে তার ক্রিয়াকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়, সে হয়ে দাঁড়ায় সন্তানকামনা ও রক্ষণের প্রতীকে। বিড়ালকে মারতে নেই—এই নিষেধ সংস্কার বা 'ট্যাবু'ই তার প্রাচীন টোটেম মর্যাদার স্বীকৃতি।

জীবনানন্দের কবিতায় বিড়াল অধিবাস্তববাদী একটি প্রত্যয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। কবির অধিবাস্তববাদী আত্মচেতনার আশ্রয়ে তাঁর অবচেতন মনে উদ্ভূত বোধকে তিনি অবিকৃত অবস্থায় এখানে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন, এতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে এটি কিঞ্চিৎ দ্বিধাজড়িত সংশয় ও দুরূহ ঠেকতে পারে। বিড়াল কবির কাছে তাঁর মগ্ন চৈতন্যের প্রকাশে যতটাই সহজ ও অভ্যস্ত হোক না কেন, এতে পাঠকের পক্ষে সবসময় তাঁর অন্তর্গহনের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়। যেহেতু কবি তাঁর মগ্ন চৈতন্যকে কবিতায় হাজির করতে চান — ফলে যেখানে যুক্তি এবং পারম্পর্য সূত্র ছিন্ন হয়, আর সেটিকে পাঠক তাঁর যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে গড়ে নেয়—এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন মানসপ্রতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব। তাই বিড়ালের যে অধিবাস্তববাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হচ্ছে, তা যে কবি ও সমস্ত পাঠকের মানস পরিচয়বাহী হবে—এ দাবি করা যায় না।

'ঝরা পালক' (কাব্য রচনাকাল ১৯২৫-২৭) বা 'বনলতা সেন' (রচনাকাল ১৯২৫-৩৬)। প্রধানত কবির নির্জনতম পর্যবেক্ষণ বা কবিকল্পনার প্রকৃতি থেকে প্রেমে রূপান্তরের পর্ব। এর ফলে 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় ক্রমশ যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ এর মধ্য দিয়ে অন্তর্লীন নৈরাশ্য ও আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, মৃত্যুর অন্ধকার টান কবি অনুভব করতে লাগলেন। শেষোক্ত পর্বে তাই প্রেমের চেয়ে অপ্রেমের কথা এসেছে। কিন্তু আলোচ্য 'বিড়াল' কবিতায় "আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা'র ভয়াবহ' প্রকাশ থাকলেও তা 'চমৎকার' ভাবে নতুন একটি সৃষ্টি হয়েছে। বিড়ালকে যদি প্রজাবৃদ্ধি বা সন্তানকামনার প্রতীকী দ্যোতনা ধরা যায় তবে এক্ষেত্রে অধিবাস্তববাদী দৃষ্টিতে জীবনের বা সত্তার এক ইতিবাচক প্রকাশ হিসাবে অবশ্যই ভাবা যেতে পারে। কবির মগ্ন চৈতন্যে যে বাসনা বা ক্ষুধা দ্বিধাজড়িত ও অবিন্যস্ত রূপে বিরাজ করছে, তারই কাব্যময় প্রক্ষেপ এ কবিতায় ঘটেছে। মগ্ন চৈতন্যের সব অনুভব যেহেতু সব সময় যুক্তি শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ থাকে না, তাই এ ধরনের কবিতায় অনেক সময় বিশৃঙ্খল—অনেকটা মনে হতে পারে অযৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত।

বিড়ালকে ধরা যেতে পারে কবির মনের অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা দ্যোতক। কবির নির্জ্ঞান মনের মধ্যে জগতের উপর নিজের স্বীকৃতি ও অধিকার স্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তার অচরিতার্থতার বেদনাই এ কবিতার উৎসার। সারা দিনই সেই আকাঙ্ক্ষা ঘুরে ফিরে আসে, সে প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় — ছায়া রোদ — বাদামি পাতা প্রতীক মাত্র। কোথাও বা কোন স্থূল বস্তুতে — মাছের কাঁটায়, কিন্তু তার পরই, কোন অন্তর্লীন নৈরাশ্যে মন নিমগ্ন হয় — শাদা মাটির কঙ্কাল — আশা নিরাশার দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ আকাঙ্ক্ষা মদির মন দোলাচল চিত্তবৃত্তি নিয়ে সমস্ত দিনমান কাটায়। অবশেষে হেমন্ত সন্ধ্যার প্রসঙ্গ এসেছে। জীবনের রঙিন স্বপ্নিল শেষ বাসনাটুকুও আলো-আঁধারের শেষ বুনন সৌকার্যে দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত কবির 'সাতটি তারার তিমির'—এর মহীনের ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ যুগ যুগান্তরের ঘোড়া আদিম স্মৃতিবাহী নিওলিথ ঘোড়া — যুগান্তরের যৌবন কামনার প্রতীক, যে যৌবন কামনা ঘোড়ার মতোই তেজোদ্দীপ্ত ছিল। আজ তা শুধুমাত্র প্র-ইতিহাসের সাক্ষ্য — প্রস্তরীভূত ফসিল — নিষ্প্রাণ হলেও "এখনও ঘাসের লোভে চরে" — অর্থাৎ কামনা নেই বটে তবে তার স্মৃতি এখনও অন্ধ আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

জীবনানন্দের প্রিয় প্রসঙ্গ হেমন্ত। হেমন্ত জীবনানন্দের কাছে শব্দ-গন্ধময়, শিশিরের মতো স্বচ্ছ, সূর্যের আলোর মতো হীরক দ্যুতিসম্পন্ন। এই হেমন্তে যেমন জীবনের মাদকতা আছে, "ঋতুর বাসরে সবচেয়ে সূক্ষ্ম সংবেদনা হেমন্তের।" তার রূপে নানা বৈপরীত্যের মিশ্রণও আছে। সে একাধারে পূর্ণতা ও রিক্ততার, জীবন ও মৃত্যুর ঋতু। একাধারে ভরা ফসল ও ফসলকাটা ফাঁকা মাঠেরও ঋতু। এই হেমন্তই আবার "শীতলতার, নির্জনতার, পরিত্যক্ত কালের প্রতীক" — "আবার মৃত্যুর, বিচ্ছেদের, ব্যথার লগ্ন," (দ্রষ্টব্য — অম্বুজ বসু — *একটি নক্ষত্র আসে*, পৃষ্ঠা ১০৮)। হেমন্ত যেমন পূর্ণতার তেমনি হেমন্ত জীবনের বিচ্ছেদ-ব্যথাতুর হৃদয়ের ঋতু। সুতরাং হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রং-এর সূর্য — জীবন প্রান্তের রঙীন স্বপ্নময় কল্পজগতের সূচক। রোমান্টিক মেজাজের কবি জীবনানন্দ যেমন ছিলেন মহৎ প্রতিভার অধিকারী, তেমন তিনি ছিলেন অনেকটাই অন্তরাশ্রয়ী। বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমে তাঁর আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তাঁর ব্যক্তিসত্তার অপ্রাপনীয়, তাই দেখা যায় তাঁর বাস্তবচেতনা প্রখর থাকা সত্ত্বেও অন্তরলগ্নমানস তাঁর উপর প্রভুত্ব করছে। জীবনানন্দ সুন্দরী প্রকৃতি ও লাবণ্যময়ী নারীকে সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর কাছে উভয়ের অনুভব একই রকম, তাই বিড়াল-এ সৌন্দর্য ও প্রেমের জন্য যে-আকুলতা বাস্তবায়িত হয়নি, তাই যেন বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা জর্জর সংবেদনে আলোকহীনতার ম্লান অন্ধকারে আবৃত হয়েছে।

বাংলা কাব্যে জীবনানন্দই বোধ করি সুররিয়ালিস্ট কবিতার পথিকৃৎ। তাঁর এ ধরনের কবিতা ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মত থাকবে এটা ধরে নিয়েই সুররিয়াজিমের পথ পরিক্রমায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর ঘোড়া, বোধ, —এরকম কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর সুররিয়ালিস্ট কবিতার বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয়নি। বিড়াল সম্পর্কে এখানে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যাত হল।

জীবনানন্দ যখন পূর্ণোদ্যমে কাব্যচর্চা করছেন তখন তাঁর সামনে ছিল বলাকা — পুনশ্চ ও লিপিকার কাব্য ও গদ্যভাষা ও ছন্দরীতির ঐশ্বর্য। জীবনানন্দ প্রধানত মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দের কবি। তাঁর শেষ পর্যায়ী কাব্যে মিশ্রবৃত্ত ছন্দকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন — কিন্তু এ ছন্দকেও কাব্য ভাবনার মতো তিনি নানাভাবে ভেঙেচুরে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছেন। কাব্যে যেমন, তেমনি ছন্দেও প্রচলিত অনুশাসন ভেঙে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। তাঁর কিছুটা মুক্তক মিশ্রবৃত্ত ছত্রে বেশিরভাগ সময় পর্বে ছত্রে মাত্রাসমকত্ব থাকেনি। একই রীতির কবিতার ছত্রে বিন্যাসে অসমান দৈর্ঘ্য দেখা যায় — কোন ছত্র যদি ২০ মাত্রার ; তো

অপরটি হয়তো ১৬ বা ৩২ মাত্রার। অসমামাত্রিক পংক্তি বিন্যাস সত্ত্বেও জীবনানন্দের 'বলাকা'র ছন্দের মতো ধ্বনির তীব্রতা বা গতির বেগ নেই। তাঁর কবিতার ছন্দগতি 'মন্থর'। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—"যেন ইচ্ছে করে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ না করা, এ ছন্দ থেমে — থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে।"

সারা দিন একটা বিড়ালের সঙ্গে / ঘুরে-ফিরে / কেবলই আমার দেখা হয় /

গাছের ছায়ায় / রোদের ভিতরে / বাদামি পাতার ভিড়ে /

কবিতার ছন্দটি অসম মাত্রিক ছন্দে ধীর মন্থর গতিতে চলছে তো চলছেই, শেষে সপ্তম ছত্রের শেষে তার বিরতি ঘটেছে।

অনুশীলনী — ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৯৯ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় নির্দেশ অনুসারে ৫১.৯ অংশটি বার বার ভালো করে পড়ে উত্তর করুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) কোথাও কয়েক টুকরো _____ _____ সফলতার পর
তারপর _____ মাটির _____ ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে _____ মতো _____ হয়ে আছে দেখি।

(খ) হেমন্তের সন্ধ্যায় _____ রং-এর সূর্যের _____ _____
_____ থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে _____ করতে দেখলাম তাকে ;

(গ) 'বিড়াল' কবিতাটির রচনাকাল _____ _____ প্রকাশ _____ চৈত্র _____।

(ঘ) 'বিড়াল' বস্তুত _____ বা _____ বা _____ কবিতা।

(ঙ) বিশৃঙ্খল _____ _____ মানসের _____ যথার্থ _____ হোল
সুররিয়ালিস্ট।

(চ) কবি যখন নিজের _____ সাহায্যে _____ ও বিশ্বকে জানেন, নিজের _____
ও _____ চৈতন্যকে জানেন তখনই _____ সৃষ্টি হয়।

২) 'বিড়াল' কবিতাটিকে অনেকে অধিবাস্তববাদী বা সুররিয়ালিস্ট কবিতা বলেন। আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩) 'সুররিয়ালিজম' বা 'অধিবাস্তববাদ' সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করুন।

৪) 'বিড়াল' সম্পর্কে প্রচলিত ভাবানুষঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৫১.১০ মূলপাঠ — ৩ ঃ ভিখিরী

ভিখিরী

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবে মানে-মানে।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিল অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত ;
তবুও তা নুলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো —
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু — হ্যারিসন রোডে — আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখিরীর ভুলে ঃ এক পৃথিবীর ভুলচুক।

৫১.১১ সারাংশ — ৩

কবিতার প্রথম স্তবকে কিছু প্রাপ্তির কথা। তারপরই অজ্ঞাত বিশ্বে নিজের স্থান করে নেবার আকাঙ্ক্ষা ও তাতে বিপর্যয়ের আভাস।

দ্বিতীয় স্তবকের সূচনায় সেই প্রাপ্তি কথা, আর স্বপ্ন সম্ভব সমৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রত্যাশা কিন্তু শেষ পরিণামে শুধু স্বপ্নভঙ্গ।

৫১.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

কবি জীবনানন্দের 'ভিখিরী' কবিতাটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত' পত্রিকার পৌষ, ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের সিগনেট দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৬১) এটি সংযোজিত হয়েছে।

'বনলতা সেন'-এর কবিতাগুলি ১৯২৫-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। আর এরই পাশাপাশি 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতার রচনাকাল যথাক্রমে ১৯২৮-১৯৪১, ১৯২৮-৪৩। অর্থাৎ তিনটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাই কালের দিক থেকে ১৯২৯-৪৩ এই শেষ প্রান্তীয় সীমায় কতকগুলি জটিল ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসে রচিত।

'ভিখিরী' কবিতার একবছর পরে পৌষ ১৩৪৮ 'নিরুক্ত' পত্রে প্রকাশিত 'লঘু মুহূর্ত' ('সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে সংকলিত) কবিতাটি একই সঙ্গে পাঠ করা উচিত। দুটির বিষয়ই ভিখিরি ও তাদের জীবনবৃত্ত। কবিতাদুটির রচনা চল্লিশের দশকে। উত্তর তিরিশ থেকে বাংলা কবিতায় একটি ভিন্ন নতুন স্বর শোনা যাচ্ছিল, তা ছিল কল্লোলের কাল থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধে যত সর্বগ্রাসী, স্বার্থান্ধ, অশুভ ও সংহারক ঘটনা — শ্রমজীবী মানুষ তো কোন্ ছার, সাধারণ মানুষের শুভাশুভের যাবতীয় ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে হানাহানি ও ধ্বংসের ব্যাপক তাণ্ডবের কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, কাব্যে ও গদ্যে ধরা পড়ছে এরই মধ্যে এদেশে শুরু হল এক নতুন বিপর্যয়—মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর—মারী, দারিদ্র্য, মানবতার ক্ষয় ও মৃত্যুর চলচ্চিত্র। এ সব ঘটনার ছায়া পড়েছিল তৎকালীন বাংলা কবিতায়। কবিরা যেন বাধ্য হয়েই সমাজ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তিরিশের কবিরাও তখন পারিপার্শ্বিকের দাবি মেনে সংগ্রাম, সাম্যবাদ ও গণচেতনার কবিতা লিখলেন। বিষ্ণু দে সরাসরি চলে এলেন সাম্যবাদের পথে, সুধীন্দ্রনাথ রাজনীতি মনস্ক নৈরাশ্যবোধের কবিতা লিখছেন। এমনকী বুদ্ধদেব বসুও লিখছেন, 'এবার তবে ঝড়' কবিতা। ফ্যাসি-বিরোধী শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে অনেকেই মিলিত হলেন, লিখলেন, 'কেন লিখি'র মতো সাহিত্যিক অঙ্গীকার।

জীবনানন্দের 'ঝরা পালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন'-এর কবিতাগুলি রচনার সমকালে এমন কতকগুলি কবিতা তিনি লিখলেন যা চরিত্রে ও উপস্থাপনায় ভিন্নতর। (১৯৪১-১৯৪২) মহাপৃথিবী ও (১৯৩৯-৪৩-এ) কয়েকটি ব্যতিক্রম সহ 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলি লেখা। এখানে জীবনানন্দ ভিন্ন ধারায় এগিয়েছেন—জটিল, বিপন্ন, নিষ্ঠুর এই সমাজপ্রেক্ষিতে তিনি কলকাতার মতো মহানগর, রাত্রি, ফুটপাথ, গ্যাসলাইট, লঙ্গারখানা, গলি, হাইড্রান্ট, করাত প্রভৃতির অর্থবহ তির্যক বাগ্‌বিন্যাসে।

বনলতার 'ভিখিরি' রচনাকাল মানুষের জীবন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কাল। এটি জীবনানন্দকে নিদারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। যুদ্ধ, কালোবাজারি, ঠিকাদার, দালাল, দুর্নীতি, বঞ্চনা, ভয় ও অভাবের সব কটি উপসর্গ সমাজ জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছে, কবি গ্রামীণ জীবনের নিসর্গ তন্ময়তা ও ইন্দ্রিয়চেতনা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ, দাঙ্গা ও দ্বিখণ্ডিত দেশে নাগরিক অস্থিরতার মানুষকে খুঁজছেন, তখন শুধু জীর্ণ, ক্ষীণ-দুর্বল, অসহায়, ক্ষুৎপীড়িত কঙ্কালসার মানুষগুলো ও তাদের দুঃসহ জীবনই শুধু নজরে আসছে। বনলতা সেন-এর 'ভিখিরি' তারই কাব্যময় প্রতিচ্ছবি।

যুদ্ধ ও ঝড়ে সর্বস্ব হারানো মানুষ জীবনের দাবিতে ভিক্ষাবৃত্তিকেই শেষ আশ্রয় করেছিল। তাদের অবিরাম অনুনয়ের কান্না, কলার নিচ থেকে, পেটের ভিতর থেকে উঠে আসা দীর্ঘ আর্তনায় শুনতে শুনতে একটা কষ্ট গলার কাছে উঠে আসে। বাড়িতে, প্রতিবেশীদের দরজায় পথে ঘাটে এই কান্না শুনতে শুনতে সাধারণ নষ্ট ও মমতার বোধও ভোঁতা হয়ে যায়। সংবেদনশীল কবি হৃদয় এ অবস্থা মানতে পারেনি। তাই সেই অবক্ষয়ের ছবি উঠে এসেছে 'ভিখিরি' কবিতায়। জীবনানন্দও সহসা রোমান্টিকতা থেকে বাস্তব অবক্ষয়ের ছবিতে এসে পৌঁছে গেলেন।

দুর্দৈবে শহর ঢুঁড়ে একটি পয়সা তথা, সামান্যতম প্রাপ্তিও জীবনের কাছে মহামূল্যবান। আরেকটি আগামী দিনের সঞ্চয়, জীনের আশার আলো, তদতিরিক্ত প্রাপ্তি তো বাঁচবার আশ্বাস। আর এই আশ্বাস থেকেই আগামী যে কোনো সংস্কারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার সঙ্কল্প—"অন্ধকারে হাত' বাড়ানো ও 'তাঁত বুনে যাওয়া'র বাসনা সম্ভব কিন্তু সেখানেও অপেক্ষমান অক্ষম 'নুলো শাঁখারির' করাত। দ্বিতীয় স্তবকে ওই প্রাপ্তির শেষে যে-কথাটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হল স্বচ্ছল সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা ছাড়া জীবনে প্রার্থিতকে পাওয়া যায় না।

প্রতিকূল পরিবেশে শত হতাশার মধ্যেও যে জীবনে আশার আলোকবর্তিকা থাকে এবং আছে বলেই মানুষ বাঁচে, বাঁচতে চায় এই পরম সত্যটি এই কবিতার প্রতিপাদ্য।

বনলতার ভিখিরির পাশাপাশি সাতটি তারার তিমির-এর লঘু মুহূর্ত কবিতায় 'তিনটি আধো আইবুড়ো ভিখিরি' ও এক ভিখিরিনীর উল্লেখ আছে। এখানে কবিতাটিতে অধিবাস্তবতার আভাস আছে। তাই বনলতার সমান্তরাল চরিত্র হিসেবে এদের গণ্য করা ঠিক হবে না। তবে তুলনায় প্রতিতুলনায় দুটি কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। 'ভিখিরি' ও 'লঘু মুহূর্তে ভিখিরির বর্ণনা আছে। ভিখিরি উচ্চারণে পাঠক মনে একটি সামাজিক অবস্থান ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। এমন কিছু মানুষ যাদের খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, আইবুড়ো তাই জীবনের স্বপ্নও নেই। দুটি ক্ষেত্রেই এ বক্তব্য প্রায় সমান। প্রথম কবিতার জন আহেরিটোলা বাদুড়বাগান মাঠকোঠা ঘুরে পাথুরিয়াঘাটা যায় পয়সার খোঁজে, আর শেষোক্তদের অন্ন জোটে না বলে তারা বায়ুভূক হয়ে থাকে—এক গাল ধূসর বাতাস খায়, তাতেই আচমন করে আর রঙিন নদী আর সব অসম্ভবের কল্পনা করে। বনলতা সেন—এর 'ভিখিরি' প্রাপ্তির আনন্দে স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু হীন চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয়েছে। এখানে প্রাপ্তিটিই ঘটেনি। বায়ুভূক ও অসম্ভবের কল্পনাতেই তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে দেখি, স্বপ্নের দেশে কল্পনার জগতে যাওয়ার আগে তারা চা-পান করতে করতে নিজেদের রাজা উজির কোটাল ভাবছে। এই সামান্য প্রাপ্তিতেই তারা তৃপ্ত উচ্ছ্বসিত। জুটে যায় এক ভিখিরিনীও। চায়ের আসরে তিনজন প্রতিবন্ধী তাকে আপনার করে নেয়।" "মিলে মিশে গেল তারা চার জোড়া কান"। তাদের হৃদয়ের এই ঔদার্য কিন্তু নেই সমাজের অন্যদের মধ্যে, তারা ভিখিরির সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করে না।

দু স্তবকের ভিখিরি এবং দুটি স্তবকের 'লঘুমুহূর্ত' কবিতার ভিখিরি ও এক ভিখিরিনীর মধ্যে সমাজ বাস্তবতার দুটি ছবিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষায় তুলে ধরেছেন। প্রথমটির পাঠক চিত্তে সরাসরি আবেদন সৃষ্টি করলেও, ব্যঞ্জনায় সে কবিতায় বক্তব্যকে বুঝে নিতে হয়। 'লঘু মুহূর্ত'-এ সর্বস্ব হারানো তিনজন মানুষের জীবনের রূঢ় বঞ্চনাকে সহনীয় করতে তাদের মত্ততার একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আর সেই সুযোগে তাদের মুখে অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন বাক্য সমাবেশ, অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ, স্বচ্ছতাহীন জীবনযাপনের পরিচয় অর্থবহ, ব্যঞ্জনাগর্ভ, তির্যক বাগ্‌বিন্যাসে, ব্যঙ্গে শ্লেষে তুলে ধরেছেন। কবি এর মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি অবিচারের স্বরূপটি বিশৃঙ্খল শব্দ ও বাক্যসজ্জা প্রতিফলিত করে যুগের বিচ্ছিন্নতা ও অসঙ্গতিকে প্রকাশ করেছেন। দুটি কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ ভিখিরি জীবনের প্রাণধারণের যন্ত্রণাকে এক শিল্পময় রূপ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ছন্দে যে অসামান্য বৈচিত্র্য এনেছেন, তার পরিয় আছে 'বলাকা'র ছন্দে। সে ছন্দও কালক্রমে মুক্তি পেয়েছে 'লিপিকা'র গদ্য ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বলা যায় কাব্যের গণ্ডির শৃঙ্খল ভেঙেছে। সেই ঐতিহ্য নিয়ে 'বলাকা' আর 'লিপিকা'র গদ্যছন্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনানন্দ তাঁর কবিতাগুলিকে প্রবহমান

পয়ারের নতুন ধরনের পরীক্ষা করেছেন। সে পরিচয় আছে ভিখিরি কবিতাতেও।

একটি পয়সা আমি / পেয়ে গেছি আহিরীটোলায় / ৮ + ১০

একটি পয়সা আামি / পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে / ৮ + ১০

একটি পয়সা যদি / পাওয়া যায় আরো— / ৮ + ৬

তবে আমি হেঁটে চলে / যাব মানে মানে। / ৮ + ৬

—প্রথম চারটি ছত্র বিন্যাসে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে, আকৃতি মহাপায়ারে হলেও, জীবনানন্দ শেষ দুটি ছত্রে বৈচিত্র্য এনেছেন।

পরবর্তী তিনটি ছত্রের বিন্যাসে—

৮ + ৬ — বলে সে বাড়ায়ে দিল / অন্ধকারে হাত /

১০ + ৮ + ৮ আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে / এক কানা যেন বুনে / চেয়ে চেয়েছিল তাঁত

৮ + ১০ তবুও তা নুলো শাঁখারীর / হাতে হয়েছে করাত।

কবিতার সমগ্র ছত্র সজ্জায় মধ্যে মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির অনুসরণ করেও যে অসামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়, তা দেখিয়েছেন।

কবিতার শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগে সহজ গদ্যভঙ্গি এবং দৈনন্দিনতার অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে, আহিরিটোলা, বাদুড়বাগান যেমন এসেছে তেমনি দেশি 'নুলো', 'ঢেঁকি' ইংরেজি গ্যাসলাইট, হ্যারিস রোড প্রভৃতি শব্দ যোজনা একালের কবি ও কবিতা ছাড়া সম্ভব ছিল না।

অনুশীলনী — ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১০০ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় নির্দেশ অনুসারে ৫.১২ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ইত্যাদি বাস করে বারবার পড়ুন। তাহলেও উত্তর করতে পারবেন।

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) আগাগোড়া _____ নিয়ে এক _____ যেন বুনে যেতে চেয়েছিল _____, তবুও তা _____ _____ হাতে হয়েছে _____।

(খ) ভিড়ের ভিতরে তবু _____ _____ আরো গভীর _____ এক _____ ভুল ; _____ ভুলে ; এক পৃথিবীর _____।

(গ) 'ভিখিরি' কবিতা _____ পত্রিকায় _____ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি _____ কাব্যগ্রন্থের _____ সালের সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে।

২। **সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

(ক) 'বনলতা সেন' কবিতাটি —

১। প্রকৃতি প্রেমের কবিতা
২। প্রেমের কবিতা
৩। অধিবাস্তববাদী কবিতা

(খ) 'বিড়াল' একটি —

১। নীতি-কবিতা
২। গীতি-কবিতা
৩। সুররিয়ালিস্ট কবিতা

(গ) জীবনানন্দ দাস রচিক কাব্যগ্রন্থ —

১। সংবর্ত
২। হেমন্ত গোধূলি
৩। বেলা অবেলা কালবেলা

৩। দুটি তালিকার একটিতে কবির অপরটিতে কাব্যের নাম আছে—কবির নামের পাশে কাব্যের সঠিক নাম লিখুন।

রবীন্দ্রনাথ	—	কুহু ও কেকা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	—	চোরাবালি
নজরুল ইসলাম	—	বন্দীর বন্দনা
মোহিতলাল মজুমদার	—	মরীচিকা
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	—	অর্কেষ্ট্রা
প্রেমেন্দ্র মিত্র	—	পারাবার
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	—	ঝরাপালক
বিষ্ণু দে	—	প্রথমা
জীবনানন্দ	—	হেমন্ত গোধূলি
অমিয় চক্রবর্তী	—	বলাকা
বুদ্ধদেব বসু	—	অগ্নিবীণা

৪। 'ভিখিরি' কবিতাটি পড়ে আপনার যে ধারণা হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫। 'ভিখিরি' কবিতার ছন্দ-বৈচিত্র্যটি বুঝিয়ে দিন।

৫১.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। ক) বিম্বিসার, অশোকের, বিদর্ভ, নগরে।

খ) শিশিরের, শব্দের, সন্ধ্যা, রৌদ্রের গন্ধ।

গ) 'বর্ষ আবাহন', ব্রহ্মবাদী, ১৩২৬।

ঘ) ১৮৯৯, ১৯৫৪।

ঙ) বিদ্রোহ, দুঃখবাদ, দেহবাদী, আবহ।

২ এবং ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫১.২ অংশে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

৪। 'উত্তরা' ও 'প্রগতি' পত্রিকা।

৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে।

৬। 'দ্রোপদীর শাড়ী', 'শীতের প্রার্থনা', 'বসন্তের উত্তর'।

৭। দৈনিক স্বরাজ।

৮। মোট ৫৯৯ টি।

৯। কবি জীবনানন্দ দাশ।

১০। ১৩৪৯ সাল, ইং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।

১১। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫১.৬ অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনার শেষাংশে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে, সেটি একটি ভালো করে পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

অনুশীলনী—২

১। ক) মাছের, কাঁটার শাদা, কঙ্কালের, মৌমাছির নিমগ্ন।

খ) জাফরান, নরম, শরীরে, শাদা, খেলা।

গ) ১৯২৬-১৯৩৬, কবিতায়, ১৩৪৩।

ঘ) সুররিয়ালিস্ট, পরাবাস্তব, অধিবাস্তববাদী।

ঙ) যুক্তিহীন, বস্ত্র, অচেতন, মগ্ন, সুররিয়ালিজমের।

২—৪ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫১.৯ অংশটি বার বার পড়ুন। তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

অনুশীলনী—৩

১। ক) শরীরটা, তাঁত ; নুলো, শাঁখারীর, করাত।

খ) হ্যারিসন, রোডে, অসুখ, পৃথিবীর, ভিখিরির, ভুলচুক।

গ) নিরুক্ত, ১৩৪৭, 'বনলতা সেন', ১৩৬১.

২। ক) প্রেমের কবিতা, খ) সুররিয়ালিস্ট কবিতা, গ) বেলা অবেলা কালবেলা

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ বলাকা ; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কুহু ও কেকা ; নজরুল ইসলাম ঃ অগ্নিবীণা ; মোহিতলাল মজুমদার ঃ হেমন্ত গোধূলি ; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ মরীচিকা ; প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ প্রথমা ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেষ্ট্রা ; বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি ; জীবনানন্দ ঃ ঝরাপালক ; অমিয় চক্রবর্তী ঃ পারাবার ; বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা।

৪ নং এবং ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর ৫১.২ সারাংশটি ভালো করে পড়ে তৈরি করুন।

৫১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)—জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ।

২) অম্বুজ বসু—একটি নক্ষত্র আসে।

৩) ড. শুদ্ধাসত্ত্ব বসু—কবি জীবনানন্দ।

৪) সঞ্জয় ভট্টাচার্য—কবি জীবনানন্দ দাশ।

৫) অরুণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ।

৬) ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।

৭) প্রভাতকুমার দাস—জীবনানন্দ দাশ।

৮। পবিত্র মুখোপাধ্যায়—সূর্যকরোজ্জ্বল কবি জীবনানন্দ।

৯। অনুষ্টুপ ঃ জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা—১৪০৫।